পিশাচ বাড়ি

অমল সাহা

চমৎকার সন্ধ্যা। একটু আগে সূর্য ডুবেছে। চারদিকের বাসা বাড়িতে লাইটগুলি জ্বলে উঠেছে। বড় রাস্তার দিক থেকে গাড়ি ঘোড়ার ভ্যাঁ শব্দ ভেসে আসছে। ঢাকা শহরে এই এক মুশকিল, সন্ধ্যা নামলেও মানুষজনের কোলাহল কমে না। দীপু একটু আগে টিভিতে স্কুল বিতর্ক দেখে টিফিন করে পড়তে বসেছে। আম্মা রাতের রান্নার জন্য কিচেনে। ছোট বোন মুক্তাটা পাশের ফ্ল্যাটের সুমীর সঙ্গে বসে ড্রয়িং রুমে বকবক করছে। সাবজেক্ট হলো, চুড়িদার। ঈদে চুড়িদারের ডিজাইন কেমন হবে তা নিয়ে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাচ্ছে। অবশ্য আব্বা বাসায় নেই—একটু পর ফিরবেন। গেছেন নিউমার্কেটে বাজার করতে। এই চান্সে দু'জন সেমিনার চালাচ্ছে।

হঠাৎ দরজার দিয়ে ছোটমামা ঢোকলেন। মুক্তা লাফিয়ে উঠলো, মামা! ছোট মামা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। অনার্স ফাইনাল ইয়ার। সাবজেক্টটা বিদঘুটে, অ্যানথ্রপোলজি। মানুষের চেহারা সুরত জাতপাত নিয়ে কারবার। সুমী উঠে গেল, আসি রে মুক্তা।

মুক্তা ছোট মামাকে নিয়ে পড়লো, মামা এবার কিন্তু দশদিন পর আমাদের বাসায় এলে।

ছোট মামার মুখ গম্ভীর। চোখের তারা স্থির। মৃত মানুষের মতো। ছোটামামা হঠাৎ অচেনা গলায় বললেন, আমি ভাল নেই।

মুক্তা একটু থমকে গেল, মামা তোমার গলা বসে গেছে ঠাণ্ডায়—দাঁড়াও মা'কে ডাকছি। মুক্তা ছুটে যায় কিচেনে।

সারা ফ্ল্যাটে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মা কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে ছোট ভাইকে দেখে অবাক হন, কিরে তোকে এমন লাগছে কেন রফিক? ছোটমামা তখনও দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি দেয়াল ভেদ করে অন্যলোকে। রাহেলা ভাইকে ধরে বসান, বোস বোস—কি হয়েছে বল তো? রফিক উত্তর দেয়, কিছু না—শরীরটা খারাপ—ভীষণ খারাপ।

তো খারাপ—থেকে যা। দুলাভাই আসবে এক্ষুণি—

ছোটমামা আগের মতো খ্যাসখেসে গলায় বলে, না আপা আমি থাকব না আমি দীপুকে নিতে এসেছি—ওকে পূবাইল নিয়ে যাব—আব্বা খুব করে দেখতে চেয়েছেন—তাই আসা।

রাহেলা বলেন, সে দেখা যাবে। তোর দুলাভাই আসুক—তুই আজ রাতে থাক।

বলতে বলতেই দীপুর আব্বা সোহেল সাহেব হাতে দু'দুটো বাজারের থলি নিয়ে ঘরে ঢোকেন, ওহ পচা গন্ধ আসছে কোত্থেকে? কি, রফিক মিয়া যে?

থলি দুটো কাজের বুয়া এসে ভিতরে নিয়ে যায়। রাহেলা বলেন, তুই আব্বাকে নিয়ে আসতি—কি যে একলা একলা পড়ে থাকেন।

দীপুর মামারা চারভাই। তিনজন বিদেশে থাকেন। শুধু ছোটমামা রফিক পড়ছেন। পড়া শেষ হলে তিনিও চলে যাবেন। দীপুর নানা একাই গ্রামের বাড়িতে থাকেন। পূবাইল চৌধুরী বাড়িটার লাগোয়া যে ঝকঝকে বাড়িটা, সেটাই দীপুর মামাদের। চৌধুরী বাড়িটাতে বর্তমানে সরকারী পাগলা গারদ। পাগলা গারদের সামনে কি করে যে মানুষ থাকে।

সারারাত দীপুদের ফ্লাটটাতে লাশ পচা গন্ধে ভরে রইল। কেউ বলল, ইঁদুর মরেছে। কেউ বলল, নিচ থেকে ড্রেনের গন্ধ আসছে। কিন্তু একটা অস্বস্তি সবার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পরদিন দুপুরে দীপু ছোটমামার সঙ্গে রওনা দিল পূবাইল। দীপু বসে বসে হিসেব করতে লাগল, এবার নানাবাড়ি যাচ্ছে অথচ একটুও আনন্দ হচ্ছে না। অথচ অন্যান্যবার নানার বাড়ি যাওয়ার কথা শুনলেই বুকটা আনন্দে নেচে উঠত। জানালা দিয় চৌধুরী বাড়ির পাগল দেখত। মুখ ভ্যাঙচাতো, বুড়ো আঙুল দেখাত। মাঝে মাঝে আবার দেয়ালের ওপাশের পাগলদের জন্য মায়াও লাগত, আহা! বেচারারা!

দীপু মামার মুখের দিকে তাকাল। মামা সামনে তাকিয়ে রয়েছে। চোখের তারা স্থির। মামাকে কেমন অচেনা লাগছে! মামা খুব কম কথা বলছেন। এমন কোনোদিন হয়নি। বাসের মধ্যে এতো ভীড়েও দীপুর গা ছমছম করে উঠল।

ওরা পূবাইল এসে পৌঁছল ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। পূবাইল জায়গাটা আসলে একটা জনবিরল গ্রাম। শুধু একটা রেল স্টেশনই আছে। যেখানে লোকজন দেখা যায়। রেল স্টেশনের পাশ ঘেঁষে গেছে ঢাকা-কালিগঞ্জ সরু পাকা রাস্তা। এরপর খাদ। খাদের এই পাড়ে পাগলা গারদ। পাশাপাশি দীপুর নানাবাড়ি। রেললাইন পার হয়ে আধ কিলোমিটার ভিতরে পূবাইল বাজার। কিন্তু এদিকটা একদম নীরব।

চারদিকে তাকিয়ে দীপুর মনে হলো, সে হঠাৎ করেই বিষণ্নতার রাজ্যে এসে পড়েছে। চারদিক এমন সুনসান নীরব। চৌধুরী বাড়ির ভিতর থেকে পাগলদের চিৎকার ভেসে আসছে। জনমানুষের চিহ্ন বলতে এই। রাস্তার মানুষ দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা। সন্ধ্যা নামলে রেললাইনের পাশের জঙ্গলে ওঁৎ পেতে থাকে গুণ্ডা ডাকাতরা। সুযোগ পেলেই পথচারীদের সব লুটে নেয় বা খুন করে ফেলে রাখে।

দরজা খুলে দিল একটা মধ্যবয়সী মহিলা। মহিলা প্রায় বামনের মতো। বেঁটে দেহের উপর বড় একটা মাথা। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, আসেন। ছোটমামা পরিচয় করিয়ে দলি, আমাদের নতুন বুয়া।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কটু একটা লাশ পচা গন্ধ নাকে এসে আঘাত করল। এই গন্ধটাই কাল্ল ছোটমামা ওদের ফ্ল্যাটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছিল। ছোটমামা দীপুর আগেই হন হন করে ভিতরে ঢুকে গেল। কাজের বুয়াটা পিছন থেকে ছোটমামাকে দাঁত কিড়মিড় করে গালি দিল হারামজদা-পচা নাড়িভুড়ি খা গিয়ে।

দীপু অবাক হলো কাজের বুয়ার ব্যবহারে। বুয়া দরজা বন্ধ করে দীপুকে বলল—

তুমি কে?

আমি ওনার ভাগ্নে।

বুয়া প্রশ্ন করে, ওকে চেন—ওই হারামজাদাকে।

চিনি তো! আমাদের ছোট মামা। দীপু আরো অবাক হয়।

মহিলা তাঁর ভয়ঙ্কর দাঁতগুলি বের করে হাসে, মামা। ওকে জুতিয়ে মামাগিরি ছোটাব।

দীপু অস্থির হয়ে ওঠে, নানা কোথায়?

মহিলা বলল, আছেন। তুমি এখানে এসেছ কেন? দীপু অবাক হয়, বাঃ আমি আসব না? এটা আমার মামার বাড়ি। বুয়া দীপুর হাত ধরে টান দেয়, আসো ছোকরা। বলে হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরে একটু ঘুপচি ঘরের চকিতে এনে বসায়। ঘরের চেহারা দেখে দীপুর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। এমন ঝকঝকে বাড়ির ভিতর এমন একটা অন্ধকার ঘুপচি ঘর থাকতে পারে চিন্তাই করা যায় না। দেয়ালে ত্রিভুজ করে তিনটা মাথার খুলি। এক কোণায় দুটো মাটির পাতিলে কাঠ কয়লার মধ্যে একটা বিড়াল আর একটা ইঁদুর পোড়া দেয়া আছে। চৌকির পাশে একটা তেপায়া। সেটার উপর জং ধরা একটা লোহার পাত্রে টকটকে সের খানিকের মতো রক্ত!

দীপু চিৎকার করে উঠল। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোলো না। বামন মহিলাটা দীপুকে সান্ত্বনা দিল, আমাকে ভয় নেই—আমি তোকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি—শতয়ানগুলোর জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম।

বামনটা দীপুর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। দু-এক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারল তাঁর মন থেকে ভয় নামক অনুভূতিটা চলে যাচ্ছে। বামনটা বিড়বিড় করে দীপুর উদ্দেশ্যে সাজেশন দিতে থাকে, সব ভয় চলে যা সব ভয় চলে যা এক-দুই-তিন। আস্তে আস্তে দীপুর চেতনা স্তর বিলুপ্ত হয়ে অবচেতন অর্থাৎ ভিতরের মনটা জেগে উঠল।

বামনটার মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয়। দীপু শরীরটা ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হয়ে বসে। একদম নতুন মানুষ। যেন অনেকদিন থেকেই এ বাড়িতে থাকে।

আসলে বামনটা তাঁকে সম্মোহিত করে রাখল। ইংরেজিতে যাকে বলে হিপনোটাইজড।

বিড়ালটা দিয়ে কি হবে? দীপুর গলাটা যান্ত্রিক শোনায়।

বামন মহিলা রাগত স্বরে জবাব দেয়, সে সব শুনে কি হবে। বামন মহিলা আসলে এক তান্ত্রিক। মৃত্যুর পরে আত্মা পরলোক যাওয়ার আগে যে দ্বিতীয় প্রেতলোকে বাস করে মহিলা সে স্তরের প্রেতাত্মাদের সাধনা করেন। এ স্তরের

প্রেতাত্মারা শরীর ধারণ করতে পারে না। শুধু অশরীরী ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এক সময় এরা পরলোকের আরো উপরের স্তরে উঠে যায়। আর যারা আত্মহত্যা করে তারা এ স্তরে থেকেই পিশাচ হয়ে মাঝে মধ্যে কোনো বিড়াল কুকুর বা অন্য কোনো ক্ষুদ্র নীচু শ্রেণীর প্রাণীর আত্মাকে মাধ্যম করে পৃথিবীতে নেমে আসে। এরা হয় ভয়াল ভয়ঙ্কর। গভীর রাত্রে যখন পৃথিবীর আলোর নিশানা মুছে যায়—সমস্ত শুভশক্তি ঘুমিয়ে পড়ে তখন এইসব পিশাচেরা তাঁদের অতৃপ্ত আত্মার ক্ষোভ নিয়ে মাটিতে নেমে আসে।

দীপু চোখের সামনে দেখল, পোড়া বেড়ালটা আস্তে আস্তে মাথা তুলছে, বামন মহিলা ছুটে গেল। বিড়বিড় করে কি যেন বলল। বিড়ালটা আবার সেই নিভু নিভু আগুনে মাথা গুঁজে দেয়।

চারদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। প্রত্যেকটা ঘরে আলো জ্বলছে। তবেই সবই লাল। হঠাৎ দরজায় ছোটমামা দেখা দিল। মুখে চেহারায় ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হওয়ার ছাপ। সেই ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, দীপু এদিকে আয়।

আসলে রফিক টের পেয়ে গেছে দীপু যে এখন আর ভয় পাচ্ছে না। দীপুকে ছিনিয়ে নিয়ে রফিক দোতলায় উঠে এল।

দীপু জিজ্ঞেস করে, মরা লাশের গন্ধ আসছে কোত্থেকে?

দাঁড়া সব দেখবি।

দীপু আমার দিকে তাকায়, রফিকের চোখগুলো কেমন অন্ধকার। যেন চোখহীন কোটর। হয়ত লাল—লাল আধো আলোতেও এমন দেখা যেতে পারে। দীপুরা একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে গেল। নতুন বাড়ি অথচ দরজায় জং ধরে গেছে। ভিতরে উজ্জ্বল আলোর বন্যা। রফিক দীপুকে ভিতরে ঠেলে দেয়, দেখ আমি আসছি।

দীপুর আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে সম্মোহিত অবস্থা কেটে যায়। আবার সে মানসিকভাবে ফিরে আসে ভয় আর আনন্দের সাধারণ অবস্থায়। ঘরভর্তি টেবিল। সেখানে শোয়ানো সারি সারি লাশ। সাদা ধবধবে কাপড় দিয়ে ঢাকা মুখটা শুধু খোলা। কোনো কোনো টেবিলের নিচে একটা করে ছোট বালতি। সেখানে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। দীপু দৌড়ে পিছন ফিরে পালাতে চাইল। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। দীপু আবার ঘরের মধ্যে তাকাল। কোণার দিকের একটা টেবিল থেকে একটা লাল শরীর তেকে সাদা কাপড়টা সরিয়ে উঠে বসল। মুখটা কুঁচকানো চামড়ায় কুৎসিত হয়ে উঠেছে। টেবিল থেকে আস্তে আস্তে নেমে উঠে দাঁড়াল। দীপুর হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। এতো আলো ঘরটাতে তবু যেন নরকের কোনো মৃতপুরীর মতো লাগছে। লাশটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দীপুর দিকে হাঁটা দিল। দীপু মূর্ছিত হওয়ার আগে শেষবারের মতো বলে উঠল, ইয়া আল্লহ।

লাশটা থমকে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎই সাপ দেখার মতো চমকে আগের মতো টেবিলে শোবার জন্য পিছন ফিরে হাঁটা ধরল। যেন কত তাড়াহুড়ো। দীপু অজ্ঞান হয়ে দরজার সামনে পড়ে রইল।

আসলে শেষ মুহূর্তে দীপুর মুখে আল্লাহর নাম শুনেই অশুভ শক্তিটা সাপ দেখার মতো চমকে উঠেছিল। জীবনমৃত্যু সৃষ্টিকর্তার হাতে। কোনো অশুভ বা শয়তান মানুষকে ভয় দেখাতে পারে মাত্র। কিন্তু সে জীবন দিতেও পারে না নিতেও পারে না।

দরজা খুলে গেল। হাতের নাড়ি দেখে বুঝে দীপু জীবিতই আছে। রফিক দীপুকে জ্যান্ত দেখে অবাক হয়, কুকুরটা মরেনি এখনো। রফিকের পিছনে বামন মহিলা। হাত ধরে ছ্যাছরে রফিক দীপুকে বাইরে নিয়ে আসে। বামন মহিলা বাধা দেয়, সরো এখান থেকে—রফিক সরে যায়। বামন, মহিলাকে গাল দিতে থাকে, কুটনী—তোর জন্যই কিছু হচ্ছে না—

বামন মহিলা ততক্ষণে দীপুর কানের কাছে বলতে শুরু করেছে, জেগে ওঠো—জেগে ওঠো—

কিছুক্ষণ পর দীপু চোখ মেলে তাকাল। মহিলা এবার দীপুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, ভয় নেই—ভয় নেই।

দীপু আগের মতো হাত পা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। তার চোখের তারা নাড়তে শুরু করেছে। ভয় টয় কোথায় চলে গেছে।

রফিকের ইচ্ছা দীপুকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলা। সে নিজে মেরে ফেলতে পারছে না। কারণ তার ইচ্ছাতে কখনো কারো মৃত্যু হতে পারে না।

রাত বাড়ছে। চারিদিক সম্পূর্ণ নিঃঝুম। দীপুর ক্ষুধা পেয়ে গেল। বামন মহিলা কোথায় চলে গেল কে জানে। সে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল। পাগলদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। সমনে দোতলার সিঁড়ি। দীপু সেই সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে আসে। দোতলায় ডানপাশের ঘরে লাল খদ্দরের ভারী পর্দা ঝুলছে। পর্দা সরিয়ে দীপু ঘরে ঢুকে দেখে তাঁর নানা একটা খাটের উপর বসে আছে। এই ঘরেও সেই লাশ পচা গন্ধ।

নানা দীপুকে দেখেই দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। সামনের দুটো দাঁত নেই। বলল, কি নানাভাই আসছো—এখানে?

দীপু উল্টো জিজ্ঞেস করল, তুমিও কি ছোটমামার মতো হয়ে গেছ?

কিরকম? নানা জানতে চায়?

ছোটমামার শরীর থেকে লাশ পচা গন্ধ বেরোয়! ওহ—হঠাৎই নানা চুপ করে যায়।

দীপু আবার বলে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে।

ফ্রীজে খাবার আছে—খেয়ে নাও। নানা তাকে বাম পাশেরা একটা ফ্রীজ দেখিয়ে দ্যান।

দীপু ফ্রীজের দরজাটা খুলেই চিৎকার করে পিছিয়ে আসে। ফ্রীজের ডীপ র‍্যাকে একটা মানুষের আস্ত মাথা বসান!

দীপু পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল খাটে নানা বসে আছে। শুধু চোখ দু'টো নেই। দীপুর আবার আতঙ্কে সম্মোহিত অবস্থা কেটে যায়। এমন সময় বামন মহিলা দীপুর হতে ধরে টান দ্যায়—চলে আসো—জানোয়ার সব।

দীপু নিচে এসে কেঁদে ফেলে, আমাকে ঢাকা দিয়ে এসো।

বামন মহিলা বলল, এখন কাঁদার সময় নয়—আমার চোখের দিকে তাকাও। মহিলা ফিসফিস করে বলতে থাকে, ভয় সব চলে যা—ভয় সব চলে যা।

দীপু আবার হিপনোটাইজড হয়ে পড়ে। ভয়টাও চলে যায়।

বামন মহিলা কি একটা মেঝেতে দাগ দিয়ে—বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। এই দাগের এখানে অন্তত এক প্রহর আসতে পারবে না কোনো প্রেতাত্মা। বামন মহিলাটা দীপুকে দুটো শুকনো খেজুর খেতে দেয়। ওকে সবকিছু গুছিয়ে বলে, কেমন তোমার বাবা মা—তোমাকে পিশাচের হাতে একা ছেড়ে দিল? তোমার নানা-প্রেতাত্মা আনার ব্যবস্থা করতেন। অর্থাৎ প্ল্যানচেট করতেন। কয়েকদিন অসুখে ভোগার পর আমাকে ডাকিয়ে আনলেন। আমি হলাম এই পূবাইলের একমাত্র ডাকিনী। অনেক অশুভ প্রেতাত্মা আমার বশ। তবে তারা শুধু মানুষের ক্ষতিই করে। ভাল করতে পারে না। তোমার নানা বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বেওয়ারিশ লাশ কিনে এনে আমার অশুভ আত্মাগুলি ওদের দেহে স্থাপন করতে বলেছেন। আমিও তাই করেছি। এগুলির সঙ্গে তিনি নাকি মৃত্যুর পর যোগাযোগ স্থাপন করবেন। আত্মা-গুলিকে সম্মোহণ করে ওই মৃত দেহের আধারে আমিই ভরে রেখেছি। তাই ওরা মাঝেমধ্যে নড়েচড়ে ওঠে। তোমার নানা বেশ ক'দিন হলো মারা গেছেন। তোমাদের খবর দেয়া হয়নি।

দরজা দিয়ে দাগের ওই পাশে রফিকের প্রেতাত্মাকে দেখা গেল। শাসাচ্ছে, বুড়ি আমি দেখব কতক্ষণ ওকে বাঁচাতে পারিস—বামন মহিলা হাত নাড়াল, যা-যা—রফিকের প্রেতাত্মা চলে যায়। মহিলা আবার বলতে শুরু করে, শোন ওই অশুভ আত্মাদের দেখাশোনার ভারটা আমি তোমার ছোট মামার কাছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার ছোটমামা গত পরশু আত্মহত্যা করে রেললাইনে। আমার মনে হয় অশুভ আত্মারাই ওকে প্ররোচনা দিয়ে আত্মহত্যা করিয়েছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি।—যখন দেখলাম চোখের তারা স্থির, তখনই বোঝলাম ও মৃত। যাইহোক তোমার দাদুও কয়েকদিন আগে মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমাকে সম্মোহিত করে নিজের দেহেই রেখে দিলেন। কিন্তু হয়ে গেলেন দুরাচার পিশাচ।

দীপু বলে, বড় মামারা জানে না—এসব?

নাহ। আমাকে এসব বলতে বারণ আছে। এই বাড়ির বাইরে কেউ আমার মুখ থেকে এসব জানলেই আমি মরে যাব। এ ব্যাপারে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রেতলোকের নিয়ম-কানুন খুব কঠিন। কেউ নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। আমি তোমাকে রাত্রির মধ্যেই মুক্তির ব্যবস্থা করে দেব। ওরা দু'জন চাইছে তোমাকে মেরে ফেলে ওদের দলে ভেড়াতে। দীপু বলল, আমাকে তুমি চুপি চুপি ঘরের দরজা খুলে দাও—আমি সোজা চলে যাব—আমি রেল স্টেশন চিনি—

মহিলা আঁৎকে ওঠে, না না প্রেতাত্মারা অশরীরী ছায়া হয়ে ঠিক জেনে নেবে এসব। প্রেতলোকের সব প্রেতাত্মাই চায় স্তর পাল্টাতে—যাতে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে—পিশাচদেরও দারুণ কষ্ট। রাত্রির শেষ দিকে এরা একবার সবাই প্রতলোক থেকে মৃত্যুর পরপারে এক সুন্দর জগতের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা সেই সময়টাই আমরা বেরিয়ে পড়ব—কিন্তু সাবধান তুমি যেন ভয় পেয়ে এর যেয়ো না—ওরা তোমাকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে—

দীপু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

নিশুতি রাত।

পাগলদের দু' একটা চিৎকার ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। দীপু বোধহীন হয়ে বসে আছে একটা ফাঁকা ঘরে। বামন মহিলা কোথায় কে জানে। জানলায় একটা পোড়া মাথা বিড়াল এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। দীপু চোখ ফিরিয়ে নিল। জিনিসটা দেখতে বিশ্রি লাগছে। হঠাৎই ছাদ থেকে টপ টপ করে কালচে রক্ত মেঝেতে পড়তে থাকে। দীপু এতক্ষণে লক্ষ্য করল তার চারদিকে একটা বৃত্ত আঁকা। রক্ত জমে ধারাটা গড়িয়ে এসে থেমে গেল বৃত্তের একটু দূরে। তারপর শুরু হলো তাণ্ডব। সমস্ত বাড়িটাকে ধুমধাম শব্দে ভেঙে চুরে ফেলতে চাইছে। দেয়ালে একটা মানুষের মূর্তি ফুটে উঠতে লাগল। বেশ ভদ্রলোকি চেহারা। কুৎসিত জিনিস দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেছে। পুরো অবয়বটা ফুটে উঠতেই ভদ্রলোক হাসল, দীপু ভাল আছ?

আরে এ যে তাদের স্কুলে অঙ্কের টিচার, সোবাহান স্যার। তিনমাস আগে লঞ্চ ডুবিতে মারা যান। লাশ পাওয়া যায় নি।

দীপু আবার ভয় পাওয়া শুরু করে; আপনি যান এখান থেকে।

যাব তবে তোমার মগজটা আমার দরকার—সোবাহান স্যার হাসেন। এই সব চলল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। তারপর সব চুপচাপ। এরপর একটানা কান্না শুরু হলো। মেয়েদের গলার করুণ সুরের কান্না।

রাত্রির শেষ প্রহরের প্রথম দিকে বামন মহিলা এলো। ফিসফিস করে বলল, চল। ওরা হাট করা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। দারুণ ফুরফুরে বাতাস। রেল লাইনে উঠে আসে নিচু জায়গায় বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ঘরে ঘরে লালচে আলো। দীপুরা স্টেশনের দিকে দ্রুত পা চালাল। চারদিকে ফর্সা হয়ে ওঠার আভাস। বামুন মহিলা রেল লাইনের একজায়গায় থমকে দাঁড়াল। দীপুকে বলল, দেখ—তোমরা রফিক মামা।

দীপু রেল লাইনের দিকে তাকাল অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল, একটা লোক, দেহটা একদিকে। মাথাটা খানিকটা দূরে উল্টে পড়ে আছে।

দীপু আবার প্রচণ্ড আঁৎকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। চোখের সামনে থেকে লাশটা উধাও। ভয়ে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে। এমন সময় পিছনের দিকে হিসহিস শব্দ শোনা গেল। বামন মহিলাও আঁৎকে ছটফট করে উঠল। ওরা আসছে—টের পেয়ে গেছে।

মহিলাটা নিজেদের চারিদিকে একবার বৃত্তাকারে হেঁটে আসল। দীপুকে বলল ভুলেও কোনো দিকে হাঁটা শুরু করবে না।

ততক্ষণে চারদিকে অশরীরী পিশাচেরা এসে দাঁড়িয়ে গেছে। রফিক বলল, দীপু তোর আব্বা কার এক্সিডেন্টে মারা গেছে—চলে আয় তোকে নিয়ে এক্ষুণি ঢাকা যেতে হবে।

বামন মহিলা শক্ত করে দীপুর হাত চেপে ধরে রাখল। দীপুর একবার হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে করল। অনেক কষ্টে ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখে। বামন মহিলা চেঁচিয়ে বলল, মিথ্যে কথা বলে লাভ হবে না।—তোরা প্রেতাত্মা-পিশাচ—

রফিকের নানার গলা শোনা গেল, দীপু নানুভাই চলে এসো—ওই ডাইনী তোমাকে মেরে ফেলবে—

দীপু বামন মহিলার মুখের দিকে তাকাল। মহিলার মাথায় সিংহের মতো কেশর গজিয়েছে। দীপু প্রচণ্ড শক্তিতে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মহিলা বলতে লাগল, দীপু আমি শর্তভঙ্গ করে ফেলেছি। প্রতিজ্ঞা ছিল বাইরে আমি কোনোদিন বলব না ওদের পিশাচ রূপের কথা। বোধহয় কেউ আমার কথা শুনে ফেলেছে। আমি মারা যাব কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি তোমাকে বলছি আমি ওদের সমস্ত আত্মাগুলি নিজের মধ্যে নিয়ে আসব—তুমি ভয় পেয়ো না। পিশাচ আত্মাগুলি আমার দেহে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরো কুৎসিত হয়ে যাব।

বামন মহিলা হাঁ করে প্রচণ্ড আক্রোশে কি যেন গিলতে চাইছে। চারদিকে ভয়ঙ্কর চিৎকার শোনা গেল, আমরা চলে যাচ্ছি—আর আসব না—আ—আ—। মরা লাশের গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠল। মহিলার মাথায় দুটো শিং গজিয়েছে। এবং দাঁত বেরোল। জিবটা লম্বা হয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়ল। অন্ধকারে কে যেন এগিয়ে এল, কে গো তোমরা কথা বলছ?

কৃষক গোছের লোক। দীপু এবার বুঝল, এই লোকটাই ভাল ডাইনীটার কথা শুনে ফেলেছে।

দীপু একবার মহিলার দিকে তাকাল। চোখ দু'টো বেরিয়ে আসতে চাইছে। এবার হাঁ-টা যেন দীপুর মাথাকে চিবিয়ে খেতে চাইছে। দীপু অজ্ঞান হয়ে রেলরাস্তার পাশে পড়ে গেল।

দীপু চোখ মেলে তাকাল। ওদের চারিদিকে একটা জটলা। বামন মহিলা পড়ে আছে পাশেই। মুখে গ্যাজলা। রোদ উঠে গেছে।

সেদিন দুপুরের মধ্যেই চৌধুরী বড়িটার পাশের ঝকঝকে বাড়িটা থেকে লোকজন আঠারটা পচা মানুষের লাশ বের করল। একটা পোড়া বেড়াল। এই ঘটনা উনিশ.শ' পঁচাত্তর ১২ ফেব্রুয়ারীর।

সেই বাড়ি এখন পিশাচ বাড়ি নামে পরিচিত। বটের ঝুরি দোয়ালে দোয়ালে।

ভিতরে সাপখোপের বাসা। অনেক রাত্রে কোনো-কোনো দিন সেই বাসা থেকে কুনকুন করে এক মহিলার কান্না শোনা যায়। দুঃখের সেই কান্না নাকি বুককে কেমন ফাঁকা ফাঁকা করে দেয়। কবে একদিন সেই সুন্দর ভোর আসবে যেদিন মায়াভরা এই ডাইনীর আত্মা কষ্টকর প্রেতলোক ছেড়ে এক আনন্দলোকের দিকে চিরদিনের মতো যাত্রা করবে। ❑